জয় ত্বং দেবি

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

সাধারণ সম্পাদিকা,
শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

সর্বশক্তিমান মহাকাল। পরিবর্তন এখানে অপরিহার্য। কালের গ্রাসে একমাত্র সত্যই অপরিবর্তিত থাকে। ধরা-ছোঁয়ার এই লৌকিক জগতের পারে চিরজাগ্রত সত্তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাস যখন সংকটে পড়ে তখন প্রয়োজন হয় সেইসব সত্যকে বারবার স্মরণ করার। তার দুটি উদ্দেশ্য—এক, প্রচলিত ঘটনার সত্যতা যাচাই; দুই, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিতকে সুদৃঢ় করা। এই কারণেই দিব্যধাম ছেড়ে মর্ত্যধামে অবতার বারবার আসেন। তাঁর আগমনে সংশয় নাশ হয়, ধর্মের নবজাগরণ ঘটে। অবতারের সঙ্গে তাঁর শক্তিরও আবির্ভাব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি শ্রীমা সারদার জীবন পুরাণ-বর্ণিত বহু ঘটনাকে সত্য প্রমাণ করেছে। শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এমনই কিছু ঘটনা স্মরণ করব।

প্রথম চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের তিনটি অংশে লিপিবদ্ধ আছে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর আবির্ভাবের কথা। প্রথম চরিত্রে মেধা ঋষি বলেছেন,

''নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।/ তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥''—মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যুরহিতা), আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হলেও তাঁর বহুপ্রকার আবির্ভাববৃত্তান্ত আমার কাছে শোনো। ললিতাসহস্রনামে দেবীকে 'দেবকার্যসমুদ্যতা' বলা হয়েছে—তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য জগতে আবির্ভূতা হন।

দেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে পুরাণে এক রমণীয় বর্ণনা পাই। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা জগজ্জননীর সন্ধান করতে করতে একটি বিল্ববৃক্ষমূলে দেখলেন অদ্ভুত দৃশ্য। বিল্বপত্রের স্তূপে শুয়ে আছেন সালংকারা এক শিশুকন্যা। এই দর্শনে আনন্দিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন তাঁরা। সে ছিল দেবতাদের নিদ্রার কাল—'অকাল', দেবীকে তাঁরা স্তব করে জাগালেন। সেই পূজাই আজও চলে আসছে। 'বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন' দেবীকে বোধিত করে—জাগিয়ে—পূজা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের জননী শ্যামাসুন্দরী দেবী একবার শিহড়ে পিত্রালয়ে যান। ফেরার পথে শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় একটি বেলগাছের নিচে বসে পড়েন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, গাছ থেকে সুন্দরী

সালংকারা এক বালিকা নেমে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ''আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।'' শ্যামা দেবী তখন হতচেতন হয়ে পড়েন। পরে সংজ্ঞা ফিরলে অনুভব করেন সেই কচি মেয়েটি তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছে। পুরাণের সেই নজির রাখার জন্যই যেন এবারেও শ্রীশ্রীমা বেলগাছ থেকে আবির্ভূতা হলেন।

দেবকী-বসুদেব কঠোর তপস্যা করে শ্রীবিষ্ণুর মতো একটি সন্তান চেয়েছিলেন। নারায়ণ নিজের মতো কাউকে খুঁজে না পেয়ে নিজেই এসেছিলেন তাঁদের সন্তান হয়ে। শ্রীশ্রীমাও পরবর্তী কালে বলেছিলেন, ''আমার বাপ-মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক... মায়ের কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন— কত সরল।... বাপ-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয়?'' পরেও মা বলেছেন, তাঁর ভাইরা তাঁকে পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই 'মাথাকাটা' তপস্যা করেছেন, না হলে কেন তিনি তাঁদের ঘরে এলেন?

মহামায়ার সব কাজই বিচিত্র। কেন তিনি প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে কষ্ট স্বীকার করলেন, পরেও সংসারে দীর্ঘকাল থেকে দেহে মনে বহু ক্লেশ স্বীকার করলেন—এসব ব্যাখ্যাতীত। আমরা তাঁর লীলারহস্য কী বুঝব! শুধু এটুকুই বলা যায়, তাঁরা এসেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। তাঁর নিজের কথায়, শুধু রসগোল্লা খেতে নয়। তাঁর জীবন আমাদের সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয় চরিত্র

মহিষাসুরের উৎপাতে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত, নিপীড়িত। তাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে জানালেন তাঁদের শক্তিহীন ও ঐশ্বর্যবিহীন হওয়ার করুণ কাহিনি। অসুরের দৌরাত্ম্যে অমরাবতী ছেড়ে মর্ত্যে 'মানুষের মতো' ঘুরে বেড়ানোর দুঃখের কথা বলে তাঁরা প্রার্থনা জানালেন উদ্ধারের জন্য। শরণাগত দেবতাদের কথা শুনে মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে ভ্রুকুঞ্চনে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। পরে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের শরীর থেকে মহাতেজ নিঃসৃত হল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হল। সব তেজ সম্মিলিত হয়ে উদ্ভূত হল এক বিশাল জ্যোতিঃপুঞ্জ। অবাক হয়ে তাঁরা দেখলেন, সেই তেজঃপুঞ্জ দিগন্ত বিস্তার করে 'জ্বলন্তমিব পর্বতম্'—জ্বলন্ত পর্বতের মতো অবস্থান করছে। পরে সেই জ্যোতি এক নারীরূপ ধারণ করল। অসুরবধের জন্য সেই দেবীকে তাঁরা অস্ত্র দিলেন; পরে দিলেন ভূষণ ও আভরণ। সেই দেবীর অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, মুকুট আকাশছোঁয়া, পদভারে পৃথিবী অবনত। সহস্রবাহুতে দশদিক ব্যাপ্ত সেই দেবীর শক্তিপ্রবাহ দেখে দেবতাদের মনে একইসঙ্গে আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হল। তাই দেবীর জয়ঘোষণা করেই দেবতারা তাঁর সামনে থেকে সরে গেলেন। যুদ্ধজয়ের পরে আমরা আবার দেবতাদের উপস্থিতি ও তাঁদের দেবীস্তুতি পাই।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা সরলা, যিনি পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী, তাঁর কাছ থেকে আমরা এমনই দুটি ঘটনা জেনেছি যেখানে তিনি মাকে বিশাল আকারে দর্শন করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে উদ্বোধনের বাড়িতে যখন তিনি ছিলেন, তখনকার কথা। একবার মায়ের সঙ্গে ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে দেখেছিলেন মায়ের বিরাটাকার রূপ। আর একবার ঠাকুরের বাসন মেজে ঘরে রাখতে এসে দেখেন, মা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, মাথা কড়িকাঠ ছুঁয়েছে, গায়ের রং জ্বলন্ত তামার মতো।

তৃতীয় চরিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় ভাগে দেবীর মহাসরস্বতী-রূপের বর্ণনা পাই। প্রবল প্রতাপান্বিত শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতারা আবার স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। তাঁদের মনে পড়ল দেবীর অভয়বাণী। মহিষাসুরকে বধ করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন, ''ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্''—হে দেবগণ, আমার কাছে তোমাদের যা বাঞ্ছনীয় তা প্রার্থনা করো। অতিবুদ্ধিমান দেবতারা প্রার্থনা করেছিলেন, ''সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ''—আমরা যখনই আপনাকে স্মরণ করব তখনই আবির্ভূতা হয়ে আমাদের ঘোর বিপদ নাশ করবেন। এভাবে নিজেদের এবং জগতের কল্যাণের জন্য দেবীকে স্তবদ্বারা প্রসন্ন করে তাঁরা বরলাভ করেছিলেন। তাই তাঁরা সমবেত হয়ে হিমালয়ে গিয়ে অপরাজিতা দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

''যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥''

—যে দেবী সকলের মধ্যে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁকে আমরা বারংবার প্রণাম করি—ইত্যাদি স্তব করতে করতে তাঁরা দেখলেন, তাঁদের সামনে দিয়ে দেবী পার্বতী জাহ্নবীর জলে স্নান করতে যাচ্ছেন। তিনি দেবতাদের কাছে জানতে চাইলেন, ''আপনারা কার স্তুতি করছেন?'' দেবতারা নিরুত্তর। তখন দেবীর শরীর-কোষ থেকে সত্ত্বপ্রধান অংশে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হয়ে বললেন, ''শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে সমবেতভাবে আমারই স্তব করছেন।'' দেবীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা বলে তিনি কৌশিকী নামে অভিহিতা হলেন। দেবী পার্বতী তখন নিজের শক্তি সম্বন্ধে যেন সচেতন হলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ষোড়শীপূজা করে নিজের সারা জীবনের তপস্যার ফল তাঁকে অর্পণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—''সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।/ শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥'' আলাদা করে তপস্যা করার প্রয়োজন তাঁর হয়নি। ঠাকুরের পূজা ও স্তবে মা যেন নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলেন। এই দৈবীভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন তিনিই সীতা, তিনিই রাধা। স্বামী শিবানন্দজী বলতেন, ''শুধু রামকৃষ্ণ- অবতারেই নয়, রাম-অবতারে সীতারূপে, কৃষ্ণ-অবতারে রুক্মিণী ও রাধারূপে আমাদের মা-ই এসেছিলেন। যুগে যুগে ঠাকুরের সঙ্গে মাকেই আসতে হয়।''

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''আমায় ডাকিস।'' আর এক সন্তান জিজ্ঞাসা করেন, ''মা, ঠাকুরের জপ তো বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি করে করব?'' মা উত্তর দেন, ''রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু বলে পার...।'' রামেশ্বর শিব দর্শন করে বলেছিলেন, ''যেমনটি রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনটিই আছেন।'' শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের এইসব ঘটনা আমাদের প্রেরণা দেয়, বিশ্বাস আনে, শাশ্বত সত্যকেই বারবার ঘোষণা করে। তাঁদের পূত জীবনে ধর্মগ্রন্থগুলি আবারও স্বীকৃতি পেল। ধর্মস্থাপনের এটি একটি নতুন দিক।